অরূপরতন বসু

প্রতারক

মনীশকে যে আমি খুব ভালোভাবে চিনি এমন নয়, তার মৃত্যুর কিছুদিন আগে তার একটা ডায়েরি আমার হাতে আসে, আর একটা ছোট্ট নোটবুক। মনীশের সঙ্গে আমি বরাবরই একটা দূরত্ব বজায় রেখেছি, বিশেষত তার বারবার নিজেকে একেবারে কপর্দকহীন, সর্বস্বান্ত করে দেয়ার যে-ঝোঁক ছিল, সেসব আমার কোনোদিনই ভালো লাগেনি। একেবারে শূন্যের ভিতর গিয়ে দাঁড়ানোর এই ঝোঁক আমার কিছুটা আত্মঘাতী মনে হয়েছে। অথচ অস্বীকার করার উপায় নেই, তার চরিত্রের এই দিকটাই আমাকে টেনেছে বেশি। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তাকে আমি দেখতে যাই, তখন তার কথা বলার কোনো উপায় ছিল না, গলায় ক্যানসার। চিকিৎসা দূরের কথা, পথ্য অর্থাৎ খাবার-ও তার জোটেনি। অবশ্য মনীশ কোনো চিকিৎসা-ও করেনি, সে কেবল ডাক্তারের কাছ থেকে, যন্ত্রণা কমানোর কিছু ওষুধ নেয়। এ-ব্যাপারে পাড়ার একটি ক্লাব থেকে সে কিছু সাহায্য-ও পায়। ব্যস আর কিছু না। এরপর তার মৃত্যু খুব স্বাভাবিক ছিল। আমাকে সেদিন দেখে সে শান্তভাবেই তার পাশে রাখা ডায়রি ও নোটবুক আমার হাতে দেয়। তার মুখে কোনো ক্ষোভ ছিল না, অনুতাপ ছিল না, অভিযোগ-ও নয়। অথচ প্রশান্তি ছিল কি ? না, তা-ও নয়। শুধু এক অসীম ঔদাসীন্য ও প্রত্যাখ্যানে ভরা তার মুখ দেখে একবার হঠাৎ-ই মনে হয়েছিল, বোধহয় শূন্যের কিছুটা আভাস সে কোনো-ভাবে দেখতে পেয়েছে। মৃত্যুর অন্তস্থলে যে পরম নৈঃশব্দ্য আছে, তারই ভূমিকা হিসেবে তার বাকশক্তি লোপ পাওয়ায় সে যে স্তব্ধ হয়ে যেতে শুরু করে, নিশ্চয়ই তার জন্য তার কোনো মনস্তাপ ছিল না, এটা আমরা ধরে নিতে পারি।

আগেই বলেছি মনীশের কাছ থেকে একটা দূরত্ব আমি বরাবরই বজায় রেখেছি। সে-ও তাই, আমার কাছ থেকে। একসময় তাকে আমি পছন্দ করতাম, ক্রমে তার জায়গায় একটা বিতৃষ্ণা চলে আসে। মনে হতো মনীশ অহংকারী। একসময় তাকে আমি ধার দিয়েছি, বেশ কয়েক হাজার। সে ধারও সে শেষ পর্যন্ত শোধ করেনি। তার চরিত্রে এটা অবশ্য বেশ মানিয়ে যায়। সে সময় সে বেশ কিছু গল্প লিখে ফেলেছে, লেখক হিসেবে তাকে তখন অনেকে চেনে। তার লেখা আমি যে পছন্দ করতাম না এমন নয়, বলতে

দ্বিধা নেই তার চিন্তাভাবনায়, বা গল্পের কোনো কোনো চরিত্রে আমার নিজের ছায়া আমি লক্ষ্য করেছি। তখন অনেক সময়ই মনে হয়েছে লেখক হিসেবে সে আমাদের কাছ থেকে যেন তার প্রাপ্যের চেয়ে বেশ কিছু বেশি-ই দাবি করছে। যেন সে ধরেই নিয়েছে সে 'লেখে' বলে আমাদেরও উচিত তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া, যেন তার 'লেখা'র জন্য সে নিজেকে যতটুকু নষ্ট করেছে, পুড়িয়ে ফেলেছে তার দায়িত্ব আমাদের, তার চারপাশের পরিচিত লোকেদের। বলতে দ্বিধা নেই, এই জন্য তাকে আমি ঘৃণা করেছি। কিন্তু 'ঘৃণা' বললে যথেষ্ট বলা হয় না, তার চেয়ে বলা ভালো আমি তাকে সন্দেহ করেছি। সে প্রকৃত লেখক কিনা, নাকি লেখকের ছদ্মবেশে কোনো প্রতারক, এই সন্দেহ আমার শেষ পর্যন্ত ছিল, তার ডায়েরি এবং নোটবুক পড়ার পরও। যেকোনো লোকেরই আত্মবিবরণীতে এক ধরনের কৈফিয়ত থাকে, আত্মপক্ষ সমর্থনের একটা স্বাভাবিক চেষ্টা থাকে, ফলে ডায়েরি ও নোটবুক পাঠ করে যেমন লোকটিকে তার ভেতর থেকে চেনা যায়, তেমনই, বলা যায় সেইজন্যই ঠিক তাকে নিরপেক্ষভাবে দেখা যায় না। কাজেই ডায়েরি ও নোটবুকের চেয়ে বড় কথা হল ঘটনা। তার জীবনের কিছু ঘটনা যদি পর পর সাজিয়ে দেখা যায়, তার কথা ও কাজের মধ্যে যথেষ্ট ফারাক রয়েছে, তাহলে অবশ্যই আমরা তার কথায় সন্দেহ করব, সন্দেহ করব তার ব্যাখ্যায় ও কৈফিয়তে। এখন ঘটনার দিকে একটু নজর দেয়া যাক। অবশ্য এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে কেন আমি মনীশকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি, সে তো গুরুত্বপূর্ণ কিছু লেখেনি, কিংবা কাজও করেনি। বস্তুতপক্ষে মনীশকে আমি গুরুত্ব দিচ্ছি না, আমি গুরুত্ব দিচ্ছি মনীশ নামে একটি 'সমস্যা'কে কিংবা ধরা যাক একটা বিশেষ মানসিক বিকারের উপসর্গকে, যার চেহারা ক্রমশই আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছে।

মনীশের জীবনের কিছু ঘটনা আমি জানি, যেসব ঘটনা সে তার নোটবুক ও ডায়েরিতে উল্লেখ করেছে, তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সে নিজেই দিয়েছে। প্রথম ঘটনা হচ্ছে তার মা-র মৃত্যু। এ সম্পর্কে মনীশের জবানীতে তার নোটবুকে যা লেখা আছে, তারই উল্লেখ করছি :

মনীশের নোটবুক থেকে

মা-র মৃত্যু শেষ পর্যন্ত আমাকে এতটা ভয়ংকরভাবে পিষে থেঁতলে দেবে তা বুঝতে পারিনি। সত্যিকথা বলতে কী মা-র মৃত্যুর পরপরই আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি, আমার নিজেকে অনেক স্বাধীন ও মুক্ত বলে মনে হয়। এর জন্য সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী দেখার কোনো দরকার নেই। এটা ঘটনা। এটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে জানি। মৃত্যুর আগে মা বদ্ধ উন্মাদ হয়ে যায়। গা থেকে জামাকাপড় জোর করে খুলে ফেলত, মুখে অশ্লীল, অশ্রাব্য ভাষা। আমাকেই মা-র দু-হাত বেঁধে রেখে পাহারা দিতে হত। অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে আমি লক্ষ্য করতাম সেই উন্মাদ বত্রিশ বছরের তরুণী কীভাবে

স্মৃতি ও স্বপ্নের জগতে ভেসে গিয়ে তার শরীর ও স্বাভাবিক চেতনার দাবিকে অগ্রাহ্য করে চলেছে। মা তখনো ছিল বত্রিশ বছরের এক স্বামীহারা লাবণ্যময়ী তরুণী। তখন আমার বয়ঃসন্ধি। মা যে তখনো তরুণী সে সম্পর্কে আমি সদ্য সচেতন হয়েছি, তার আগে পর্যন্ত অর্থাৎ আমার গোটা বাল্য ও শৈশব কেটেছে মা-র হাতে প্রচণ্ড প্রহার ও ভর্ৎসনায়। বাবার মৃত্যুর পর অত্যাচারী বাবার ভূমিকা আমার মাকেই নিতে হয়। কিন্তু বয়ঃসন্ধির সময় হঠাৎ-ই মার জন্য আমার করুণা ও সমবেদনা আসে। তবু মার মৃত্যুর ঠিক পরেই এক ধরনের মুক্তির স্বাদ পাই। কিন্তু তার পাশাপাশি এক ভয়ংকর নিরাপত্তাবোধের অভাব আমাকে মাঝে মাঝেই দারুণ উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার দিকে ঠেলে দিতে থাকে। কোনো কোনো সময় এই উদ্বেগ, আতঙ্কের পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছয়। এই সময় আমি অস্থির হয়ে উঠতাম, আমার নারী সঙ্গের প্রয়োজন হতো।

এর অনেকদিন পর হঠাৎ-ই হারমান হেসের ডেমিয়ান বইটি আমার হাতে আসে। তাতে, বিস্মিত হয়ে লক্ষ্য করি, ডেমিয়ান, তার, এক সহপাঠীর মার প্রেমে পড়েছে। সেই মহিলার কোমল সোনালী অলকগুচ্ছের স্পর্শে শিহরিত হয়ে প্রথম চুম্বনের মুহূর্তে ডেমিয়ান একই সঙ্গে নারী ও জননীর সুরভিত ওষ্ঠাধরের স্বাদে বসন্তের ফুল ও ফলের ঘ্রাণ পাচ্ছে। আমি হেসকে ধন্যবাদ জানাই। আমার হঠাৎ-ই মনে পড়ে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে মার চুম্বনের কথা। প্রতিবেশী এক বন্ধুর সঙ্গে আমি দূরের একটি শহরে বেড়াতে যাবো। এর আগে আমি কখনো মাকে ছেড়ে দূরের কোনো অপরিচিত ব্যক্তির বাড়িতে থাকিনি। যাওয়ার আগের দিন তেতলার ছাদে অপরাহ্নের ম্লান আলোয় হঠাৎ অশ্রু ঝলমল চোখে মা আমাকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে ও গালে চুম্বন দেয়। এখনো সেই চুম্বনের স্মৃতি হঠাৎই মাঝে মাঝে এক অকালমৃত তরুণীর ম্লান বিষণ্ণ চোখ ও মূর্তিকে যেন সময়ের পরপার থেকে এক মৃদু তরঙ্গের ঝাপটায় আমার সামনে নিয়ে আসে। সে মূর্তি যেন অস্ফুট ভাষায় কিছু বলতে চায়, তারপর পলকের মধ্যে শিশির বিন্দুর মতো ভেঙে চুরমার হয়ে ফের মিশে যায় স্রোতে।

মার মৃত্যু কেন ও কীভাবে হয় তা এই মুহূর্তে বলছি না। শুধু স্মৃতি ও সময় নিয়ে এক অবিরাম জটিল ভাবনার মধ্যে ভেসে চলেছি। সেদিন স্টানিস্লাভ লেমের 'নক্ষত্র ডায়েরি' পড়লাম। তার একটি গল্পে মহাকাশে সময়ের আবর্ত বা টাইম ভরটেকসর উল্লেখ আছে যেখানে প্রতি মুহূর্তের 'আমি'-র সঙ্গে আমার দেখা হতে পারে। যেখানে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ একাকার হয়ে আছে। সম্ভবত সেখানে মার সঙ্গে দেখা হলে এই ৫৩ বছরের 'আমি' এক ৩২ বছরের তরুণীকেই দেখতে পাবো। স্মৃতি ও সময়ের রহস্য নিয়ে এক জীবন ভাবনার জালে জড়িয়ে পড়ছি।

লেখকের বক্তব্য

চারপাশের বাস্তব জগত সম্পর্কে মনীশের একটু অসুস্থ ঔদাসীন্য বোধহয় এসময়

থেকেই তাকে ঠেলে দেয় দিবাস্বপ্ন ও মনোবিকারের দিকে, যেখানে তার কাছে ঘুম ও জাগরণ প্রায় একাকার হয়ে যেতে থাকে। মনীশের ব্যক্তিত্বে যে উন্মাদ হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, তা এখান থেকেই লক্ষ্য করা যায়। নোটবুকের এই অংশে মনীশ কিছুটা কবিত্ব করেছে মৃত্যু সম্পর্কে। কিন্তু আমি খুব ভালোভাবেই জানি যে এমন কি তার কোনো বন্ধুর মৃত্যুতেও শবযাত্রায় অংশ নেয়নি। তার এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ার কাছ থেকে আমি জানতে পারি, এমনকি তার মায়ের মৃত্যুর দিন ভোরবেলায় সে নিশ্চিন্তে ঘুমোয়, তাকে ঠেলে ঘুম ভাঙিয়ে ডাক্তারের কাছে পাঠানোর আগেই তার মার মৃত্যু হয়। এ সম্পর্কে মনীশের ব্যাখ্যা কী তা জানার আগ্রহ আমার ছিল। তার নোটবুক তন্ন তন্ন করে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় কয়েক লাইন পাই। তাদের নিচে তুলে দিচ্ছি :

মার মৃত্যু সম্পর্কে আমার দায়িত্ব

পর পর কয়েকদিন ভোররাতে ডাক্তারের কাছে যাই। সেদিনও গিয়ে ওষুধ এনে ঘুমিয়ে পড়ি। মার অবস্থা খুবই খারাপ। হঠাৎ একসময় কেউ আমাকে ফের ধাক্কা দিয়ে জাগায়। উঠতে সামান্য দেরি হয়। কিন্তু উঠি। ফের ডাক্তারের কাছ থেকে ওষুধ এনে বাড়িতে ঢুকতেই কান্নার রোল শুনি। আমার মেজমাসী আমাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলেন : 'ছি ছি, তুই দেরি করে গেলি, তোর জন্যই তো—'

আমি কিছুই বলিনা, মাথা নিচু করে থাকি। আমি জানি মার মৃত্যুর জন্য দায়ী কে। যে দায়ী সে কিছুক্ষণ পরেই খাট ও রজনীগন্ধার গোছা নিয়ে আসে। তার ভাঙা গাল, কোটরে বসা চোখ, শিকারি বেড়ালের মতো তীব্র ধূর্ত চোখের মণি ঘুরতে ঘুরতে মেজমাসীর মুখে স্থির হয়। আজ তার গলায় সিল্কের গাঢ় নস্যিরঙের স্কার্ফ বাঁধা নেই, পরনে সিল্কের শার্ট ও গ্যাবার্ডিনের ট্রাউজার্স নেই। রমণীমোহনদা আজ খুবই শোকার্ত। কিন্তু কুমারী মেজমাসীকে ছেড়ে তরুণী বিধবা, আমার মায়ের দিকে চলে যাওয়ার জন্য মেজমাসী কখনো রমণীমোহনকে ক্ষমা করেনি। আজ তাই মেজমাসীর ক্রন্দনরত ওষ্ঠাধরে বিদ্রূপ লক্ষ্য করে রমণীমোহন মৃতের শবযাত্রার দিকে মন দেয়।

আমি সবকিছু লক্ষ্য করি।

হা ঈশ্বর !

লেখকের বক্তব্য

এই কটি লাইন পড়ে বোঝা যাচ্ছে কিশোর বয়স থেকেই মনীশের মন সন্দেহপ্রবণ। আমি পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছি মনীশের মার মৃত্যুর ব্যাপারে রমণীমোহনের ভূমিকা থাকলেও তার সঙ্গে মনীশের আত্মীয়াটির কোনো সম্পর্ক ছিল না। মনীশ যে সন্দেহপ্রবণ ছিল, তা আমি তার স্ত্রী ও দুই প্রেমিকার কাছ থেকে আরো জানতে পারি। এমনকি

আমাকেও সে তার প্রেম-ব্যাপারে সন্দেহ করেছে। তার প্রথম যৌন অভিজ্ঞতাও সুস্থ নয়। আমি এবিষয়ে কিছুই বলতে চাই না। তার নোটবুকই এবিষয়ে সাক্ষ্য দিক :

মনীশের নোটবুক

আমার প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা ঘটে স্বপ্নে! আমাদের শহরের পুলিস সুপারিনটেনডেন্ট যিনি ছিলেন, তাঁর ছিল একটি হুডখোলা লাল গাড়ি, আর কিশোরী দুই মেয়ে। আমি স্বপ্নে দেখি সেই লাল হুডখোলা গাড়িটি চেপে তারা বেড়াতে চলেছে। আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে। হঠাৎ গাড়ি থেকে একটি মেয়ে আমার দিকে একটি চিঠি ছুঁড়ে দেয়। আমি হাত বাড়িয়ে রাস্তা থেকে চিঠি তুলে নিতে যাব, এমন সময় ঘুম ভেঙে যায়। হাতে ছোঁওয়া লাগে এক নগ্ন নারীশরীরের। তিনি আমার মাতৃসমা একজন। ভয়ে ও অপরাধে সারারাত জেগে থাকি।

লেখকের বক্তব্য

বয়স্ক মহিলাদের সম্পর্কে মনীশের যে যুবক বয়স থেকেই আগ্রহ ছিল, তা আমি জানি। অন্তত একজন তিরিশোর্ধা মহিলার সঙ্গে তার আঠারো বছর বয়সে যে সম্পর্ক হয় তার খুঁটিনাটিও একসময় আমি জানতাম। মনীশের সঙ্গে আমি তাঁর বাড়িতেও গেছি। কিন্তু মনীশের নারীসঙ্গ সম্পর্কে আমার আগ্রহ কম। আমি তার স্বপ্ন ও স্মৃতির জগৎ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলাম। অথবা বলা ভালো তার 'অন্তর্জগৎ' সম্পর্কে আমার আগ্রহ। কেননা আমার ধারণা মনীশ তার বাইরের জীবন ও জগৎকে প্রতারণা করতে শুরু করে এই তথাকথিত 'অন্তর্জগতে'র তাড়নায়।

বলা ভালো, আমি 'অন্তর্জগতে' বিশ্বাসী নই। আমি বিশ্বাস করি মানুষের আচরণ-ই হচ্ছে তার একমাত্র পরিচয়। অথবা বলা যায় তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। মনীশের একটানা নানান নারী সংসর্গ, তার অসুখী ও ভগ্ন দাম্পত্যজীবন, তার অবিরাম ঋণ করা ও ঋণ শোধ না-দেয়া, তার আত্মহত্যার চেষ্টা তার চাকুরিতে ইস্তফা দেয়া, তার সর্বস্বান্ত হওয়া, তার ঐশ্বরিক ধ্যান ও অভিজ্ঞতা, এ সবই আমার মনে হয়েছে যেন ন্যাড়া ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে ঘুমের ভিতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া নিশ্চিত পতনের দিকে। বিশেষত তার ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা যে তার মনোবিকারের চরম পর্যায় এ বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল্ না। এই জন্যই আমি তার স্মৃতি ও স্বপ্নের জগৎ সম্পর্কে আগ্রহী ছিলাম।

মনীশের নোটবুক

অর্ফিউস সম্পর্কে একজায়গায় পড়লাম, শেষপর্যন্ত আত্মার মুক্তি হচ্ছে স্মৃতির

পুণ্য ঝর্ণা নেমোসাইনির জল পান করায়। এক মৃত্যুর ভিতর থেকে অন্যমৃত্যুতে, এক জন্ম থেকে অপর জন্মে ভেসে যেতে যেতে আত্মা তার পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে যদি সে বিস্মৃত না-হয় কখনো, যদি তার স্মৃতি থাকে জাগরূক। মৃত্যুর পরে যদি এই হয় তাহলে মৃত্যুর আগেও তাই, অর্থাৎ একবার পেছন ফিরে গোটা জীবনকে দেখে নেয়া, স্মৃতিতে। টেবিল ল্যাম্পের নিচে গ্লোব কত ছোটো, কিন্তু স্মৃতিতে কী বিশাল, যেন অন্তহীন। বোদলেয়ারের 'ভ্রমণ' কবিতাটি শুরু হচ্ছে এভাবে। আর বোর্হেসের গল্পেও পড়েছিলাম, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড়িয়ে একটি লোক পাঁচ মিনিটের মধ্যে তার গোটা জীবনকে দেখে নিচ্ছে। গোটা জীবনকে দেখে নেয়া সম্ভব নয়। বিশেষত যদি স্বপ্ন ও স্মৃতির কথা ভাবি। কাল রাত্রে দুবার একটি প্লেনে চড়ার স্বপ্ন দেখলাম। আজ সকালে খবরের কাগজ খুলে দেখি ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় সমস্ত যাত্রীর মৃত্যু। এ-দুয়ের মধ্যে কোনো যোগাযোগ আছে কিনা জানি না, স্বপ্নে আমার প্লেনে চড়ায় কোনো গোলযোগ হয়নি। খুব নিরাপদে চমৎকার ভাবে ওঠানামা করেছি। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে প্রতিদিনের স্বপ্ন মনে থাকে না। এখন প্রায় দিনই রুনুকে স্বপ্নে দেখছি। রুনুর সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাচ্ছে বলে? রুনুর সঙ্গে প্রায়ই ঝগড়া; চলে যেতে বলছি, নিজেও বলছে চলে যাবে। আমিও বলছি সব শেষ করে দেবো, কিন্তু কিছুই শেষ হচ্ছে না। এই অসুখ থেকে আমার রেহাই নেই, মৃত্যু, ভয়াবহ মৃত্যুযন্ত্রণার দিকে এগিয়ে চলেছি, এ রোগের কোনো চিকিৎসা নেই, আরোগ্য নেই। রুনু তবু যাবে না। অথবা এ-ও হতে পারে আমি রুনুকে ছাড়তে চাইছি না। রুনুকে ছেড়ে দিলেই রুনু চলে যাবে। মৃত্যুর কথা মনে হলে অবশ্যই মার কথা মনে পড়ে। মৃত্যুর আগের মনোবিকার- ভয়ংকর। সরোজ বলে, আমি বিকারগ্রস্ত। আমি অস্বীকার করি না। তবু সরোজকে আমি স্বাভাবিক ভাবি, যদিও সরোজ, আলাপ হওয়ার বহু আগেই, মার্গারেটকে স্বপ্নে দেখে। অবশ্য স্বপ্নে ঠিক মার্গারেট নয়, একটি বিদেশী কিশোরীকে তার দিকে অনেকটা শাগাল-এর ছবিতে যেমন দেখা যায় সেভাবেই ভেসে আসতে দেখে সে। এর বহুবছর পর ভবতোষ যখন তার স্ত্রী অর্থাৎ মার্গারেটের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় তখনই চিনতে পারে সরোজ, আরে একে তো সে স্বপ্নে দেখেছে! আমার মেজোমেসোও তাই। মেজো-মাসীকে নাকি স্বপ্নে দেখেন, তারপর রাস্তায় আলাপ। আমি যাদের স্বপ্নে দেখি তাদের সঙ্গে রাস্তায় কখনো দেখা হয় না।

শেষবার মার্গারেট ক-দিনের জন্য এখানে এসে চলে যায়। সরোজ আমাকে এয়ার-পোর্টে নিয়ে গেছিল। গভীর রাত্রে প্লেন। মাঝে মাঝে হু-হু হাওয়ার সঙ্গে গম্ভীর জেটের শব্দ। ঘূরন্ত সার্চলাইটের আলো। মার্গারেটদের প্লেন আসতে এখনো দেরি। সামনেই একটা বিদেশী প্লেন ছাড়ছে, তার ঘুরন্ত লাল আলো দপ্‌দপ করে জ্বলছে নিভছে, অনেকটা হৃৎস্পন্দনের মতো। মার্গারেট হঠাৎ আমায় ডাকলো—'মনীশ, এদিকে শোনো—।

আমি এগিয়ে গেলাম। মার্গারেট বলল, 'আমি সরোজকে চিঠি দিলে ও উত্তর দেয় না কেন?' আমার যা মাথায় আসে তাই বলি, 'হয়ত উত্তর দেয়নি বলে আজ তোমরা বুঝতে পারছ, কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছ।'

'তুমি ওর খবর জানিয়ে চিঠি দেবে?'

'দেব।'

ঠিক আছে।'

মার্গারেটকে খুশি দেখায়। আমি লক্ষ্য করি ভবতোষ একটু বেশি মনোযোগের সঙ্গে কফিতে চুমুক দিচ্ছে। একটু পরেই ওদের প্লেনের ডাক এলো। ওরা এগিয়ে যায়। আর দেখা হয় না। ওদের প্লেন ছাড়ার আগেই আমি আর সরোজ, নমিতাদের গাড়িতে চেপে নমিতাদের ফ্লাটে যাই। গাড়ি চালাচ্ছিল নমিতার স্বামী বিনোদ। চমৎকার ছেলে। পাঁচ পেগে সামান্য নেশা হয়। সে রাত্রে বিনোদ আমাদের অবিরাম স্কচ সরবরাহ করে গেল। ওদের অসুবিধে নেই, ওরা কাস্টমসের লোক। শেষ রাতের দিকে যখন এমনকি বিনোদও নেশাগ্রস্ত, তখন কী আশ্চর্য নমিতা আমাকে একপাশে ডেকে বলল, 'তোমার কী মনে হয় মনীশ, সরোজ সত্যিই মার্গারেটকে ভালোবাসে?'

আমি নেশাগ্রস্তের মতো হেসে বলি, 'তোমার কি মনে হয় নমিতা তুমি ভবতোষকে ভালোবাস?'

এই সময় বিনোদ হা-হা করে হেসে উঠে বলে, 'কী যে ভালোবাসাবাসির কথা তোমরা বলে চলেছ।'

নমিতা ঘুরে দাঁড়িয়ে বলে, 'চুপ কর বিনোদ, তোমার নেশা হয়ে গেছে।' বিনোদ উঠে বারান্দার দিকে চলে যায়। সরোজ এবার কাছে এসে কিছুটা জড়িত গলায় বলে, 'তোমার কি মনে হয় নমিতা একরাত্রে একজীবনের ভালোবাসাবাসি সম্ভব?'

নমিতা মুহূর্তের মধ্যে ছিটকে সরে যায়। আমার মনে পড়ে ভবতোষ, তার বিয়ের আগে যেবার এখানে আসে, সেবারই এক বন্ধুর বাড়িতে রাত্রির নেশার টানে, নমিতার সঙ্গে একই ঘরে রাত কাটায়। তারপরের দিন ভবতোষ চলে যায় রাতের আটলান্টিকের দিকে, আন্তর্জাতিক তারিখরেখা পেরিয়ে, মার্গারেটকে বিয়ে-ও করে ফ্যালে সে, কিন্তু নমিতা এখনো ভোলেনি সেই রাতের কথা, ভবতোষকে নিয়ে এখনো তার মনে প্রশ্ন আছে, বিনোদ তখন ছিল লাডাকের এক সীমান্তবর্তী গাঁ-এ। যে-সময় জনহীন, ঘটনাহীন, ইতিহাসহীন, সেই শূন্য সময়ের ভিতর একের পর এক হঠাৎ ঘটনা এসে হাজির হয় ভোরের সমুদ্র-দিগন্তে হঠাৎ উঠে আসা একঝাঁক নৌকোর মাস্তুলের মতো; আর তারপর থেকে প্রতিটি ঘটনা তার নির্দয় ক্ষমাহীন পারম্পর্য অনুসরণ করে এগোতে থাকে উপকূলের দিকে যতক্ষণ না বালিয়াড়ির দিকে পৌঁছোয়, যতক্ষণ না নিজের পাটাতনের গর্ত খুলে ভাঁড়ারের অন্ধকার থেকে বের করে আনে সমুদ্রের ভিতর থেকে তুলে আনা তার মাছের ঝাঁক, তার শিকার। সরোজ তার স্বপ্নে দেখা কিশোরীর কথা

ভুলে গেছে। সরোজ তার স্বপ্নের কথা-ও সেদিন অস্বীকার করল।

যা তার জীবনে ঘটছে, সবই নাকি জাগ্রত অবস্থায়।

লেখকের বক্তব্য

আমার জীবনে স্বপ্নের প্রভাব কম। মনীশের উপরোক্ত অংশ পড়ে বুঝতে পারছি, ঘটনা একভাবে ঘটেছে আর তার ব্যাখ্যা অন্যভাবে দিয়ে চলেছে মনীশ। হঁ্যা, মার্গারেটকে দেখার বহু আগেই আমি প্রায় কিশোর বয়সে একটি বিদেশী কিশোরীকে স্বপ্ন দেখি, যার মুখ আমার মনে না-থাকলেও মার্গারেটকে দেখামাত্রই তার কথা মনে হয়েছিল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে মার্গারেটের খবর, তার সাক্ষাতের বহু আগেই কেউ আমাকে স্বপ্নে পেঁাছে দিয়েছে, এমন কোনো জগৎ থেকে, যা লৌকিক নয়।

নিশ্চেতনা, নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্বে আমি বিশ্বাস করি না। রহস্যে আমার বিশ্বাস নেই বা বিশ্বাস করলেও রহস্য হচ্ছে আমার কাছে প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হওয়ার মতো, যার, একের পর এক সূত্র খুঁজে বের করে, কিনারা করা সম্ভব। এ বিষয়ে আমি সার্ত্রের সঙ্গে একমত।

মনীশ যে অবিকল স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়ে আত্মার মুক্তি খুঁজছে, তা হাস্যকর। প্রথমত তার স্মৃতিচারণায় যথেষ্ট ভেজাল আছে, দ্বিতীয়ত এক জন্ম থেকে অপর জন্মে, এক মৃত্যু থেকে অপর মৃত্যুর দিকে ভেসে যাওয়া··· ? না, একজীবনে কাপুরুষরাই বেশ কয়েকবার মারা যায় শুনেছি, আর মিথ্যাবাদীরা বেশ কয়েকবার জন্মায়। কিন্তু একথা সত্যের খাতিরে মানতেই হবে যে মনীশ মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ ছিল না। তাহলে? সম্ভবত মনীশ ভুলবশত স্মৃতির পুণ্যঝর্ণা নেমোসাইনির জল পান না-করে বিস্মৃতির নদী লিদির জল পান করে ফেলেছে। হায় অর্ফিউস!

মনীশের নোটবুক

সর্বনাশ হয়েছে, সত্যি-ই অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি। একদা ওয়াল্টার বেঞ্জামিনের প্রুস্ত সংক্রান্ত লেখায় পড়েছিলাম যে-স্মৃতি কাউকেই বলা যায় না, সেই স্মৃতি দু-দণ্ডের আলাপে ট্রেনে বলে দেয়া যায় এমন সহযাত্রীকে, যার সঙ্গে জীবনে আর কখনো দেখা হবে না।

প্রত্নতত্ত্ববিদরা, গ্রীসে, প্রাচীন সমাধিমন্দিরের ফলকের গায় যেসব অর্ফিক শোকগাথা খুঁজে পেয়েছেন তার একটি উল্লেখ করছি :

মৃত্যুপুরীর বাঁদিকে পাবে একটি ফোয়ারা
ঐ ফোয়ারার পাশেই আছে একটি শাদা সাইপ্রেস গাছ
এদের কাছাকাছি যেওনা

কিন্তু আরেকটি ফোয়ারা পাবে স্মৃতির হ্রদের পাশে
যার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে শীতল জলধারা
তার সামনে আছে প্রহরীর দল
সেখানে গিয়ে বলো, আমি পৃথিবী ও নক্ষত্রলোকের সন্তান,
বলো : আমি মর্ত্য ও স্বর্গের সন্তান,
যদিও জাতির দিক থেকে আমি স্বর্গবাসী দেবসম্প্রদায়ের লোক
তৃষ্ণার্ত আমি
স্মৃতির হ্রদের পুণ্য জলধারা আমাকে দাও
তারা তখন তোমাকে সেই শীতল জলধারায় তৃষ্ণা মেটাতে দেবে

এই নেমোসাইনির জলধারা আমার চাই। কাল থেকে রাতের সমস্ত স্বপ্ন ভোরবেলায় উঠে চেষ্টা করব মনে করতে। কাল থেকে সকালে যেন কেউ আমায় না-ডাকে। আরতিকে বারণ করে দেব। একেবারে শৈশবের কিছু স্মৃতি খুঁজে দেখি, হাতড়ে দেখি, হয়ত তাহলে আমার পরিণাম বুঝতে পারব। বীজের মধ্যে যেমন গাছ, তেমনি শৈশবের স্মৃতির মধ্যে কোথাও হয়ত আমার পরিণাম লুকিয়ে আছে।

কিন্তু আশ্চর্য! বঙ্কিমবাবু, কৃষ্ণকান্তের উইলের শেষে রোহিণীর মৃত্যু ও গোবিন্দলালের অন্তর্ধানের পর যখন বারুণি পুষ্করিণীর সংস্কার সাধন করলেন তখন ভ্রমরের স্মৃতি-মন্দিরের আশেপাশে উইলো ও সাইপ্রেস গাছ পোঁতা হল। উইলোর উল্লেখমাত্র হ্যামলেটে ওফেলিয়ার কথা মনে পড়ে। বোধহয় উইলো গাছের নিচেই জলের ভিতর থেকে ভেসে উঠেছিল ওফেলিয়ার শব, আর সাইপ্রেস গাছ ?

অর্ফিউস কিংবদন্তীর স্মৃতিচারণ, মৃত্যুপুরীর শোকচিহ্ন ? কিন্তু স্মৃতি একসঙ্গে অবিকল ধরা পড়ে না। ছেঁড়াখোঁড়া, ছিন্নভিন্ন হয়ে সে ছড়িয়ে থাকে চারদিকে। দেখি তার কিছু টুকরো উদ্ধার করতে পারি কিনা।

লেখকের বক্তব্য

আমি জানি অবিকল স্মৃতিচারণ অসম্ভব। পরাজিত ব্যক্তিদের সান্ত্বনা পুরস্কার দরকার হয়। ঠিক আছে মনীশ তা-ই নিয়ে খুশি থাক।

মনীশের নোটবুক

স্মৃতির কথা ভাবতে গিয়ে 'সময়' নিয়ে যেই ভাবছি, অমনি গণ্ডগোলে পড়ছি। একটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি থাকলে বোধহয় সুবিধে হয়। অতএব কিছু আনাড়ির মতোই ভাবার চেষ্টা করছি। শুনেছি বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার আগে অনন্ত বা কালহীন, থাকতে

পারে, কিন্তু 'সময়' ছিল কি ? বৈজ্ঞানিকরা বলছেন, না, সময় ছিল না বা তার আগে সময়ের কথা বলা নিরর্থক। তাই তাঁদের মতে বিশ্ব সৃষ্টি হওয়ার আগের মুহূর্তটি O-T বা শূন্য সময়। তবু কিছু নাছোড়বান্দা বিজ্ঞানী আছেন, যাঁরা সময়ের আগে-ও সময়ের কথা ভাবেন। কেন ভাবেন ? কী ভাবে ভাবেন ? বিস্ফোরণের পর তার টুকরোগুলো যেমন চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে থাকে তেমনই মহাবিশ্ব কেবলই চারদিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে, কিন্তু এটা তখনই সম্ভব যদি বিশ্ব আদিতে একটি বিন্দু থেকে শুরু হয়। শোনা যায় আইনস্টাইন নাকি এরকমই ইঙ্গিত করেছিলেন, আর সেই ইঙ্গিত অনুসরণ করে দু-জন ইংরেজ বৈজ্ঞানিক রোজার পেনরোজ ও স্টিফেন হকিং অংক দিয়ে প্রমাণ করলেন বিশ্ব শুরু হয়েছে একটি অতি সূক্ষ্ম বিন্দু থেকে যার ভিতর এখনকার বিশ্বের সমস্ত ভর (mass) ও শক্তি পোরা। ফলে এক অকল্পনীয় ব্যাপার, ওখানে নাকি বিজ্ঞানের কোনো নিয়মই খাটে না। স্থানকালের জ্যামিতি নাকি ওখানে অনন্ত বক্রতায় তচনচ হয়ে গেছে। তাই বিজ্ঞানীরা আবার শুরু করলেন নতুন করে ভাবতে, এবার বিন্দুর জায়গায় এলো বুদ্বুদ বা বাবুল ! হকিং নিজের তত্ত্ব নিজেই পরিত্যাগ করে বুদ্বুদ তত্ত্ব নিয়ে মাতলেন, কেননা এখানে বিজ্ঞানের নিয়ম খাটে। কিন্তু এ তত্ত্ব-ও ঠিকমতো দাঁড় করানো যাচ্ছে না। তবু শূন্য সময়ের আগে সময় থাকতে পারে আর তা নিয়ে ভাবা হচ্ছে, এটা ভাবতেই মজা লাগে তবে এ সমস্যার নাকি এক অভিনব সমাধান হাজির করেছেন হকিং, বলছেন, আদিতে বিন্দুও ছিল না, বুদ্বুদও ছিল না, ছিল শুধু এক স্থান-কালের বর্তুল আভাস। ফলে বিশ্বের কোনো স্থান-কালের সীমান্ত নেই, কাল্পনিক সংখ্যা দিয়ে কাল্পনিক সময় মাপলে এ সমস্যার সমাধান হবে, যদিও বাস্তব সময়ে বিশ্বের শুরু ও শেষ আছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কোনটা বেশি বাস্তব ? কাল্পনিক না বাস্তব সময় ? নাকি স্মৃতির সময়টা বেশি বাস্তব ? ফের বোদলেয়ারের কবিতা মনে পড়ছে,··· টেবিল ল্যাম্পের নিচে গ্লোব কত ছোটো, কিন্তু স্মৃতিতে, কল্পনায় কী বিশাল, যেন অন্তহীন,··· এখানেই স্মৃতির একটা ষড়যন্ত্র লক্ষ্য করছি, বইয়ে দেখতে পাচ্ছি ঠিক এর উল্টো : টেবিল ল্যাম্পের নিচে মনে হয় পৃথিবী কী বিশাল, আর স্মৃতিতে মনে হয় কত ছোটো :

> How big the world by lamp light does appear
> How small the world is in our memory

সর্বনাশ ! ভুলে যাচ্ছি, অনেক কিছু ভুলে যাচ্ছি। কেন ভুলে যাচ্ছি। কেন প্রতারণা করছে স্মৃতি, স্মৃতি কি প্রতারক ? বিস্মৃতির অন্ধকার নদী লিদির সর্বনাশা টান বড় ভয়ংকর, ফের বোদলেয়ারের 'লিদি' কবিতায় দেখতে পাচ্ছি :

> I know of nowhere like your bed's abyss
> To swallow up my agony, now gone ;
> Upon your lips dwells great oblivion,

And Lethe flows on in your every kiss.

লিদি তাহলে নারী, যার শয্যার গহ্বরে আছে সমস্ত কষ্টের শেষ, ওষ্ঠে আছে মহাবিস্মরণ, আর চুম্বনের প্রবাহে আছে অন্ধকারের স্রোত।

In petticoats all fragrant with your scent
Bury my aching and uneasy head
And breathe in, like a flower long since dead
The musty sweetness of my love now spent

যার অন্তর্বাসের সুগন্ধে পীড়িত মাথা ডুবিয়ে রেখে বহুক্ষণ আগে মৃত বাসি ফুলের মিষ্টি গন্ধের মতো সদ্য খরচ হ'য়ে যাওয়া প্রেমের সুরভি, নিঃশ্বাসের সঙ্গে মিশিয়ে নেয়া যায়।

তবু নারী বিস্মরণ নয়। অন্তত লীলা তা ছিল না, রুনু-ও নয়। তবু একথাও ঠিক, নারী শরীরে যে অন্ধকার আছে, তাতে ডুবে যাওয়া যায়, ঘুম বিস্মরণ ও নৈঃশব্দের সর্বশেষ স্তর ছুঁয়ে বোঝা যায়, এ এক অনন্ত মৃত্যুর দরজা যা খুলে দিলে মাতৃগর্ভের আশ্রয় হয়ত-বা মেলে। ফলে মাতৃগর্ভের স্মৃতি কিছু আছে কিনা তা-ও ভেবে দেখতে হয়। কোনো কোনো মনোবৈজ্ঞানিক যেমন লেইং বলছেন, আছে। মাতৃগর্ভের স্মৃতি ধরা আছে উপকথায় কিংবদন্তীতে, আর স্বপ্নে। মোজেস বা কর্ণের জন্মবৃত্তান্তের মূলে আছে মাতৃগর্ভের স্মৃতি। কিন্তু সে কথা পরে, কেননা মাতৃগর্ভের-ও আগে, মৃত্যুর পরের কোনো স্মৃতি আছে কিনা, একথা-ও তাহলে ভেবে দেখতে হয়। মৃত্যুর পরের স্মৃতি নিয়ে গবেষণা করেছেন স্টানিস্লাভ গ্রাফ। সেঁ-ও বড় অদ্ভুত। থাক সে কথা। আগে দেখা যাক শৈশবের সবচেয়ে আগেকার কোন স্মৃতি মনে করতে পারি…

খুব ঝাপশাভাবে মনে পড়ে ঠাকুমার কোলে চেপে কলকাতার একটি রাস্তা দিয়ে চলেছি, হঠাৎ সাইরেন বাজল, রাস্তায় লোকজন ছুটছে, ঠাকুমাও দ্রুত হেঁটে, বোধহয় বাড়িতে। দোতলার খোলা ছাদ, সেখানে চেয়ারে বসা ফর্সা চেহারার হৃষ্টপুষ্ট একজন প্রৌঢ়। কে তিনি, মনে নেই। একটা ঝাঁকড়াচুলো ধূসরসাদা বড় বড় লোমেভরা আদুরে কুকুর, একজন অত্যন্ত ফর্সা চেহারার রূপবান তরুণ, বাবা? না কাকা? জানি না। অস্পষ্টভাবে মনে পড়ছে সবুজ রঙের ছাদখোলা দোতলা বাস, আবার একতলা সবুজ রঙের প্রাইভেট বাসের জানালার ওপরের নীল বা সবুজ কাচের ভিতর দিয়ে বাইরের চলমান রাস্তাঘাটের বেশ মায়াবী দৃশ্য, আবার একসময় কোথায় যেন দেখেছি রাস্তায় ট্যাঙ্ক… তারপর অনেকটা জুড়ে কিছু নেই, সিনেমার ফিল্ম ছিঁড়ে গেলে যেমন হয়। ফের আরেকদিন, সন্ধ্যার বা রাতের ট্রেনে মার সঙ্গে অপরিচিত এক স্টেশনে নেমে ঘোড়ার গাড়ি চেপে এগোতে থাকা কাঁচা রাস্তা ধরে। ঘোড়ার খুরের শব্দ, চাবুকের আওয়াজ, ধীরে ধীরে কিছু বাড়িঘরদোর ও রাস্তা ঘুরে একটা প্রায়ান্ধকার গলি, যার একপ্রান্তে জ্বলছে কেরোসিন ল্যাম্পপোস্টের আলো, তার সামনে সাদা রঙের প্রকাণ্ড একটি বাড়ি,

তার গোল বারান্দা, তার একতলা থেকে ছাদ পর্যন্ত কাচের জানালার সার। এই বাড়িতেই ঢুকলাম। ঐ কাচের জানালার সারের কথা আজো মনে আছে। এইবার আরো অনেক কিছু পর পর মনে পড়বে, সেসব আমি বলে যেতে পারি, বলবও। কিন্তু আজ নয়। এত ছোটবেলার কথা বলতে ভালো লাগে না। কেবল আগেকার ঐ ঝাপশা স্মৃতি থেকে বুঝতে পারছি, বাবার মৃত্যুর পর মা, আমাকে নিয়ে কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে মফঃস্বল শহরে মামাবাড়িতে ফিরে এলো। মার এখানেই মৃত্যু। রমণীমোহনদার গ্রামের বাড়িতে তিনদিন বেড়িয়ে আসার খেসারত। কীভাবে এই লোকটির সঙ্গে মার আলাপ তা বলার দরকার নেই ; ও আগেই এসেছিল, সম্ভবত মেজমাসীর টানে। তারপর বয়সে বড়, মার সঙ্গে আলাপ ও পরে ঘনিষ্ঠতা। ডাকত 'দিদি' বলে। ফলে যে ঘরে আমি কেরোসিন টেবিলল্যাম্পের আলোর সামনে বসে পড়ার বইয়ের নিচে লুকিয়ে রেমার্কের 'তিনবন্ধু' পড়ছি, সে ঘরেই আমার পেছনদিকের খাটে বসে দুজনের গল্পগুজব। মাঝে মাঝে নিচু গলার আলাপ, গাঢ় নিঃশ্বাস, এ সবকিছু কানে এলেও কিছু বুঝিনি। কিন্তু এরপর নাইট শো-তে দু-জনের সিনেমা দেখা, খুবই খারাপ লেগেছে। তবু তখনও নয়। বোধহয় কিছুটা বুঝতে পেরেছিলাম যখন বিকারের ঘোরে মার প্রলাপে দুজনের অন্তরঙ্গ দৃশ্যের কিছুটা ভেসে আসে। অমানুষিক কষ্টে, অপমানে মার দু-হাত বেঁধে রেখে মার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চিৎকার করে কাঁদতে চাইতাম, কিন্তু পারতাম না, কেবল প্রাণপণ দাঁতে দাঁত চেপে ঠোঁট কামড়ে নিজেকে সামলাতাম, কিন্তু দুচোখ ছাপিয়ে জল ভরে উঠত। হা ঈশ্বর !

আজ আর আমি সেই কষ্ট পেতে চাই না, অথচ ঐ একই কষ্ট লীলা আমায় দিয়েছে, রুনু দিচ্ছে। দুজনেই দ্বিতীয় সম্পর্ক তৈরি করেছে· অপর পুরুষের দিকে চলে গেছে। আমি পড়ে আছি, ডাস্টবিনে পরিত্যক্ত অবৈধ শিশুর মতো। বোধহয় বিনয়ের কবিতার একটি লাইন থেকে এই উপমা মনে পড়ল। বিনয়ের নিজের রহস্যালোক আছে, বোধহয় গণিত ও কবিতায়। আমার কিছু নেই, শেষ ট্রেন চলে যাওয়ার পর রাতের প্ল্যাটফর্মে বসে থাকা ভিখারির মতো আমি শূন্য চোখে তাকিয়ে রয়েছি, কোনো আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই, কিছু নেই। কেবল ভিতর থেকে মাথা, অসাড় হয়ে আসছে। তাহলে বেঁচে আছি কী করে? এখানেই একটা মজার ব্যাপার ঘটছে। যখন সমস্ত হিসেবনিকেশ ভেঙে প'ড়ে মনও তচনচ হয়ে ভেঙে পড়ছে, যেন একটা দানবিক মেশিন ভেতর থেকে চুরমার হয়ে যাচ্ছে, তখনই সবকিছু ভেঙে যাওয়ার পর, সমস্ত আশা, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাওয়ার পর, হঠাৎ যেন ভেসে উঠছি জলের উপর, জানিনা কীভাবে একের পর এক ঘটনা ঘটছে, আর তারই ধাক্কায় ভেসে চলেছি, খুব ছোট ছোট ঘটনা, যেন বলা যায় অতিপরমাণুর স্তরে কিছু একটা ঘটছে···

একটি অতিপরমাণুর স্থান-কালের ভিতর দিয়ে চলে যাওয়ার পথ কে বলা হয় ওয়ার্ল্ড লাইন বা বিশ্বরেখা। এরকম পর পর বা পাশাপাশি বেশ কয়েকটি কণিকা

ভেসে চলেছে, তাদের পরস্পরের মধ্যে আলো পেঁছিতে পারলেই যোগাযোগ হবে, কিন্তু তাদের ভিতর যদি এতটাই দূরত্ব থাকে যেখানে আলোও পেঁছিতে পারে না, বা অন্যভাবে বলা যায়, যাদের মধ্যে এমনই দূরত্ব যে আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে খবর পাঠালে তবেই যোগাযোগ হবে,—সেখানে যদি দেখা যায় যোগাযোগ হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে পরমাণুরা পরস্পরের মধ্যে খবর পাঠাতে পারে, তারা 'অচেতন' নয়, তাদের 'চেতনা' আছে। একে কোয়ান্টামবলবিদ্যার ভাষায় বলা হয় পরমাণুর অনৈসর্গিক (বা অলৌকিক?) যোগাযোগ (Non local connection)। সেরকম কোন ঘটনা কি ঘটছে কোথাও, সেরকম কি কোনো সুদূর এলাকা থেকে খবর আসছে? জানিনা বুঝতে পারছি না, কেবল লক্ষ্য রাখতে হবে খুব ছোটখাটো ঘটনার ওপর। কেন এই মুহূর্তে আমি এই লাইন বা এই বাক্য লিখছি, কেন অন্য সময়ে, এই একই জায়গা থেকে শুরু করলে অন্য বাক্য লিখতাম, তার নির্দেশ কোথায় আছে, তার সংকেত কোথেকে আসছে? যখন আমি সঙ্গে থাকি না তখন রুনু কী করে, নবীনের সঙ্গে কোথায় যায়, কী কথা বলে, তা কি আমি জানি, তা কি আমি জানতে পারব? জানা যেতো যদি আমি অবিরাম ওদের দুজনকে নজরে রাখতাম, কিন্তু তাহলে যা আমি দেখতাম, তা-ই জানতাম, কিন্তু যখন আমার দৃষ্টির বাইরে ওরা থাকত— কোনো না কোনো সময় তা তো থাকবেই— তখন কী ঘটতো, তা আমার চিরকালের জন্য জানার বাইরে। আর এখানেই গণ্ডগোল। পরমাণুর মতোই এ-ও কেবল 'দেখা'র সময় জানা যাবে 'আছে', কিন্তু দেখার আগে পর্যন্ত আছে কি নেই, থাকলে কোথায় আছে, কিছুই নিশ্চিতভাবে বলা যাবে না, এই অনিশ্চয়তা নিয়েই বেঁচে থাকতে হবে, 'মন' থাকার খেসারত এই। এসব ফের ভাবতে হবে, আরো ভাবতে হবে।

লেখকের বক্তব্য

এত ফালতু ব্যাপার নিয়ে ভাবার যে কী দরকার, তা বুঝি না। অবশ্য আসল ব্যাপার হচ্ছে 'সন্দেহ', আর 'হিংসা'। মনীশের স্মৃতি যে প্রতারক তা বোদলেয়ারের কবিতা থেকে আগেই প্রমাণ হয়েছে। 'সময়' ও 'পরমাণু' সম্পর্কে ওর বাগাড়ম্বর হাস্যকর, পপুলার সায়েন্সের বই পড়ে কিছু চালু ধারণা এদিকওদিক লাগালেই তার ভিত্তি 'বৈজ্ঞানিক' হয় না। আমি বাজী ফেলে বলতে পারি মনীশ অংক জানে না। আর অংক না জেনে বিজ্ঞান নিয়ে কথা বলা, বিশেষত আধুনিক বিজ্ঞানের জটিল সব তত্ত্ব নিয়ে কথা বলা নেহাতই হাস্যকর। তারপর আবার আধুনিক বিজ্ঞানকে অধ্যাত্মবাদের পক্ষে দাঁড় করানোও একটা ছেলেমানুষী ব্যাপার। এ চেষ্টা আগেও হয়েছে। তারপর বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত বা আবিষ্কার থেকে দার্শনিক সিদ্ধান্তে পেঁছিনোও খুব একটা নিরাপদ নয়। তবে মনীশকে আটকাবে কে? সে আর যাই হোক দেবদূত নয়। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের

নন লোকাল কানেকশন নিয়েও দেখছি মনীশ কথা বলছে, যদিও এর বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়েছেন, স্বয়ং আইনস্টাইন।

মনীশের নোটবুক

আমি গণিত জানি না। কিন্তু গণিত না জানলেই বিজ্ঞান সম্পর্কে বা আধুনিক বিজ্ঞানের কয়েকটি মূল অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ, বা সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কথা বলা যাবে না এমন নয়। বস্তুতপক্ষে ছবি আঁকা বা কবিতার মতোই গণিত একটি ভাষা, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্তার মূল বা আদিম কোনো স্তর বা ভিত্তিভূমি আছে কিনা তা খুঁজে দেখা। গণিতের অজুহাতে যারা বিজ্ঞানকে সাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চান, তাঁরা নিজেদের মনে করেন 'সত্যে'র একচেটিয়া কারবারী, তাঁরা প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের মূল অনুসন্ধান কী তা জানেন না, বা জানলেও তা গোপন করতে চান। এঁরা এক ধরনের পুরোহিততন্ত্র কায়েম করতে চান। আর বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ থেকে দার্শনিক সিদ্ধান্ত বা ধ্যানধারণায় পৌঁছন তো একটি স্বাভাবিক ব্যাপার। বিজ্ঞানের দর্শন বা ফিলসফি অফ সায়েন্স বলে একটি বিষয় আছে, তা কি সরোজ জানে না? এ ছাড়া বহু বৈজ্ঞানিকই প্রাঞ্জল ভাষায় তাঁদের বৈজ্ঞানিক ভাবনা ব্যক্ত করে গেছেন। এতে দোষের কী আছে? আইনস্টাইন, জীন্স হাইজেনবার্গ, শ্রয়ডিংগার সকলেই। আর স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ গণিত না-জেনেও বিজ্ঞান সম্পর্কে লিখেছেন, এতে অপরাধের কী আছে; এমনকি এ শতাব্দীর একজন সেরা বৈজ্ঞানিক ইলিয়া প্রিগোজিন তো আইনস্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার বর্ণনা করে বলেছেন আধুনিক বিজ্ঞান ক্রমশই রবীন্দ্রনাথের 'বিশ্বমানবের ধারণা কিংবা অংশগ্রহণকারী বিশ্বভাবনার দিকে এগিয়ে চলেছে অথচ রবীন্দ্রনাথ বৈজ্ঞানিক ছিলেন না। আইনস্টাইনের একটি অপরিবর্তনীয়, অনড়, কালহীন অনন্ত সত্তার ভাবনার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের বিবর্তমান অংশ-গ্রহণকারী বিশ্বমানবের ধারণাই আধুনিক বিজ্ঞানের অনেক কাছাকাছি।

নীলস বোরের সঙ্গে আইনস্টাইনের ভীষণ ঝগড়া নিয়ে সেদিন কথা হচ্ছিল সরোজের সঙ্গে। আইনস্টাইনের মতে ননলোকাল কানেকশন (বা অনৈসর্গিক যোগাযোগ) সত্য হলে কোয়ান্টাম মেকানিক্স সত্য, আর তাহলে টেলিপ্যাথিও সত্য। নীলস বোর বলেছিলেন যে-দুটি কণিকা বহুদূরে থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে খবর পাঠাচ্ছে, তারা একই 'সমগ্র'র অংশ। তাই কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সত্য। ১৯৮২ সালে প্যারিসের একটি গবেষণাগারেও এটা প্রমাণিত হলো যে আইনস্টাইনের আপত্তি ভুল। নীলস বোরের কথাই ঠিক। কিন্তু এ সব তো বহু পুরনো কথা। সকলেই জানে। তবু সরোজ মানে না কেন?

লেখকের বক্তব্য

খুব সোজা ব্যাপার। সকলেই এবিষয়ে এখনো একমত নয়, এই জন্যই যে ওসব মানতে গেলে, টেলিপ্যাথি, ভগবান ও ক্রমে ভূত বা 'অলৌকিক' মানতে হয়। ওসব ছাড়াই যখন বিজ্ঞান এগোতে পারে, তখন আরো গবেষণা দরকার। পরীক্ষায় যা-ই প্রমাণিত হ'ক, ওসব না-মেনেও দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞান দিব্যি এগোচ্ছে। বরঞ্চ অন্য কোনো তত্ত্ব বা পরীক্ষা দিয়ে যদি ওসব পাশ কাটিয়ে যাওয়া যায়, তাহলে তাই ভালো।

ইলেকট্রনের চরিত্র কিছুটা অনিশ্চিত, কিন্তু তার মানে ভূত ও ভগবান আছে, এমন কথা মানতে গেলেতো মহামুশকিল !

মনীশের নোটবুক

যাক ! সরোজ তাহলে অনিশ্চয়তা মানে। বোঝে কি ? আমি কি হিংসুক, সন্দেহপ্রবণ ? সেদিন রুনু আমাকে তাই বলল। ওর চোখে মুখে ঘৃণা, বিতৃষ্ণা আর প্রত্যাখান। আমি আয়নায় রোজ মুখ দেখি, সেকথা রুনুকে বললাম, বললাম 'জানি আমি কুৎসিত হয়ে গেছি, বয়সের ছাপ, বার্ধক্যের ছাপ আমার চেহারায়'। রুনু ক্ষমাহীনভাবে বলে, 'হ্যাঁ, তোমার চামড়া কুঁচকে গেছে, তুমি তা-ও আমার পেছনে পড়ে আছো কেন ? তোমার লজ্জা করে না ?'

আমি স্তব্ধ হয়ে থাকি। রুনুকে আমি চিনতে পারি না। নবীন ওদের অফিসে কাজ করে। ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে দহরম মহরম আছে, সম্ভবত এঁদেরই আত্মীয়। সেলসের লোক। অনেক টাকা, দেদার ঘুষ খায়, কোম্পানীর মাল জালিয়াতি ক'রে বাজারে বিক্রি করে, মেয়েছেলে-ও সরবরাহ করে খদ্দেরদের। হোন্ডা মোটরসাইকেল চেপে ঘুরে বেড়ায়, পেছনে রুনুকে চাপায়, আমি তা দেখেছি বেশ কয়েকবার। ঠিক হিংসায় নয়, অবিশ্বাস ও ঘৃণায় আমি কালো হ'য়ে গেছি। রুনু এর কাছ থেকে টাকা নিয়ে ছোটভাইয়ের জন্য, ওদের অফিসে স্টেশনারী মাল সাপ্লাইয়ের ব্যবসা করেছে ; প্রথম চোটে তিনটে শাড়ি, বিন্দি, চুড়ি, এছাড়াও আরো অনেক 'গিফ্‌ট' যেমন ঘড়ি দিয়েছে রুনুকে, রুনু অম্লানবদনে সব নিয়েছে। আমি প্রথমে ধরতে পারিনি কী হচ্ছে। চাকরি ছেড়ে দেয়ার পর আমার সব টাকা যখন মজুমদার নামে এক জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে খোয়া গেল, তখন আমি রুনুকে বললাম, চলে যেতে, রুনু বলল, 'বললেই কি যাওয়া যায় ?' আমি ফের বললাম, 'তুমি চলে যাও রুনু একসঙ্গে দুজনেই ডুবে লাভ নেই, ডুবন্ত লোক সামনে যাকে পায় তাকেই আঁকড়ে ধরে, তাতে তোমার দম বন্ধ হয়ে যাবে রুনু, তুমি পারবে না।' কিন্তু রুনুর সেই এককথা, 'যেতে বললেই কি যাওয়া যায় ?'

এরপর আমি বীরেনের পাল্লায় পড়লাম। কারও পাল্লায় বলা ভুল আসলে আমি নিজেরই এক মারাত্মক ভুলের পাল্লায় পড়লাম, হঠাৎ-ই আমার মাথায় এলো, আচ্ছা

রেসের মাঠ থেকে টাকা তোলা যায় না ? অনেকেই তো দেখি গোছা গোছা টাকা আনে, যেমন বীরেন। যদি ওর কাছ থেকে কিছু শেখা যায়। বীরেন অবশ্য আমায় বোঝালো, 'রেসের মাঠেও 'অংক' আছে। যদি অংকটা ঠিকভাবে শেখা যায় মনীশ, তাহলে তুমি আমার মতোই পারবে। এই যেমন ধরো ঘোড়ার ট্র্যাক রেকর্ড, পেডিগ্রি, হ্যান্ডিক্যাপ, বিশেষত হ্যান্ডিক্যাপটা ভীষণ জরুরি…' আমি ঐ সব বোঝায় মন দিলাম। কিন্তু টাকা কোথায় ? আমার হাতে তো টাকা নেই। এখান ওখান থেকে টাকা চেয়ে আনি, ধার করি। রুনুর বাবার পেটে ক্যান্সার। টার্মিনাল কেস, তার ওষুধ কেনার জন্য রুনু আমাকে সপ্তাহে সপ্তাহে টাকা দেয়। আমি ওষুধের দোকানে টাকা বাকি রেখে রেসের মাঠে গেলাম। হ্যাঁ বীরেনের কথামতো খেলে প্রথম চোটে বেশ কিছু টাকা হাতে এলো। আমি ওষুধের দোকানের ধার শোধ দিলাম, রুনুকেও বললাম। রুনু বলল, 'ওমা তাই নাকি ? তাহলে সকলে যে বলে ওখানে সবাই ফতুর হয়ে আসে।'

আমি-সদ্য বিজয়ীর গর্বে বলি, 'দূর ওসব বাজে কথা।' রুনু বলে, 'তুমি আমাকে ওখানে নিয়ে চলো না' আমি এবার একটু মুশকিলে পড়ে যাই। বলি, 'না এখন না রুনু, আগে একটু ব্যাপারটা দেখে নিই।'

কিন্তু ব্যাপারটা দেখতে গিয়েই আমি গন্ডগোলে পড়ি। বেশ কিছু হেরে যাই। অবশ্য রুনুর বাবার ওষুধ আসতে থাকে, কিন্তু দোকানে বেশ কিছু টাকা বাকি পড়ে যায়। রুনুর মুখে অবিশ্বাসের সামান্য আভাস দেখি। তখনও ঠিক বুঝতে পারি না। রুনু এবার বোনাস পায়। বোনাসের প্রায় সব টাকা আমি মাঠে লাগাই, তখন আমার রোখ চেপে গেছে। কিন্তু সবই হারি। রুনুর মুখ কালো হয়ে যায়। আমি তখনো ভাবছি, একটা সামান্য ভুলের জন্যই এটা হলো। তখনো বুঝতে পারছি না, আমার নেশা হয়ে গেছে। ঐ সামান্য ভুল সকলেই করতে থাকে দিনের পর দিন। তারপর সর্বস্বান্ত হ'য়ে যায়। কিন্তু তার আগেই রুনু আমাকে চরমপত্র দিল। একদিন বলল, 'রোজ রোজ তোমাকে আমি কোত্থেকে টাকা দেব বলত ?'

আমি তখন রোজই, রুনুর কাছ থেকে কিছু না কিছু টাকা নিই। বাড়ির জন্য, নিজের জন্য, এমন কি কোনো কোনোদিন আমার কাছে চা-খাওয়ার পয়সা-ও থাকে না! রুনু তখন প্রায়ই দেরি করে আসে, আমি বাসস্টপে দাঁড়িয়ে থেকে অধৈর্য হয়ে পড়ি। প্রায় ৩০ মিনিট কখনো ৪৫ মিনিট দেরি করে এসে রুনু থপ্ করে আমার হাতে দু-পাঁচ টাকা গুঁজে দিয়ে বলে, 'ইস্ অনেক দেরি হয়ে গেছে', বলে চটপট একটা ফিরতি বাসে উঠে যায়। ভালো করে কথাও হয় না। একদিন ভীষণ মরীয়া হয়ে ওকে আমি বলি, 'তোমার রোজ রোজ এত দেরি হয় কেন রুনু। অফিসে কি এতই কাজ ?'

রুনু এবার তার বাঁকানো ঠোঁটে রহস্য ঢেলে বলে, 'না, অফিস না, নবীন আমাকে রোজ মোটর সাইকেল করে পৌঁছে দেয় তো। ওর সঙ্গে তাই একটু বসতে হয়। নইলে অভদ্র ভাববে।'

'নবীন কে ?' আমি একটু অবাক হয়ে বলি।

'ও তুমি চিনবে না। আমাদের অফিসে কাজ করে। ভীষণ ভালো। সকলকে ধার দেয়। কিন্তু কারও কাছ থেকে ফেরত নেয় না। অনেক টাকা তো—'

'মাড়োয়ারি ?' আমি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে বলি।

'না, ওরা ইউ. পি.-র লোক।' রুনু বলে, 'ওর চেহারা, কথা, সঙ্গ, এসব আমার খুব ভালো লাগে। ও আমার বন্ধু।'

'বন্ধু ? কই আগে বলনি তো ?'

'এই তো বললাম। আচ্ছা আজ চলি—' ব'লে টুক করে একটা বাসে উঠে চলে যায় রুনু। আমি স্তম্ভিত হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকি।

লেখকের বক্তব্য

আমি কিছুই মন্তব্য করতে চাই না। মনীশ, রুনুর সঙ্গে যা করেছে, তা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ কিনা তা পাঠকই বিচার করবেন। তবে এরপর মনীশের রুনুকে সন্দেহ করার অধিকার আছে কিনা এ বিষয়ে স্বভাবতই প্রশ্নে উঠবে। আমি রুনুর জায়গায় থাকলে বহুদিন আগে আরো নির্দয়ভাবে মনীশের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, মনীশের মৃত্যুর দিন পর্যন্ত রুনু তার কাছে ছিল, যখন একে একে সকলেই মনীশকে ছেড়ে গেছে। হয়ত এ-ই প্রেম। কিংবা এও হ'তে পারে রুনু ঠিক সুস্থ নয়, এটা তার এক মনোবিকার। ঠিক কী তা আমি জানি না।

অর্ফিউস, কোয়ান্টাম মেকানিক্স, প্রেমিকার টাকায় রেসের মাঠ, ভণ্ডামীর একটা সীমা থাকা উচিত!

মনীশের নোটবুক

ইতিমধ্যে পুজো এসে গেছে। তার আগেই রুনুর বাবা মারা গেলেন। নবীন আর রুনু রোজই হাসপাতালে গেছে। আমি যেতে চেয়েছিলাম, রুনু আমাকে বারণ করেছিল। অবশ্য তখনো রুনুর বাবা মারা যাননি, তখনো তাঁর যথেষ্ট জ্ঞান ছিল। কিন্তু, কোমায় বেশ কয়েকদিন থাকার পর, রুনু আমাকে হঠাৎই বলে, 'তুমি একদিনও দেখতে গেলে না ?'

আমি হাসপাতালে গেলাম, গিয়ে দেখি রুনুর বাবা তখনো কোমার ভিতরই আছেন। রুনু ব'সে আছে। কিছুক্ষণ পরেই সে বলে, 'এখুনি ভাই, মা, নবীন সকলেই আসবে—।' আমি তার ইঙ্গিত বুঝে উঠে পড়ি।

পরের দিন রুনুর বাসস্টপে আসার কথা। গিয়ে দেখি রুনু আসেনি। অফিসে ফোন করে জানতে পারি, সেদিনই রুনুর বাবা মারা গেছেন।

দু-সপ্তাহ পরে রুনুকে ফোন করি। সে প্রথমেই বলে, 'বাড়িতে এলে না কেন ?'

'বাড়িতে ?' আমি বলি, 'তুমি যে যেতে বারণ করেছিলে।'

'তা বলে এই সময়ে নয়। যাকগে কেন ডাকছ ?'

'তুমি আসবে না ?'

'ঠিক আছে যাব।' রুনু ফোন ছেড়ে দেয়।

নির্দিষ্ট দিনে রুনু আসে। ইতিমধ্যে কিছু টাকা জোগাড় ক'রে আমি ওষুধের দোকানের টাকা মিটিয়ে দিয়েছি। কিন্তু হাতে আর টাকা নেই। সেদিন রুনু এসেই অভিযোগ করে আমার কর্তব্যে অবহেলার জন্য। বাড়িতে যেতে যে রুনুই বারণ করেছিল, কেননা বাড়ির লোক আমার চেহারা ও বয়স দেখে ভয়ানক অপছন্দ করবে, এটা ওকে মনে করিয়ে দিলেও ওর রাগ কমে না। 'এমন কি ঘোষও এসেছিল,' সে বলে।

'ঘোষ ?' আমি আঁৎকে উঠি।

'হ্যাঁ, ঘোষ। পাগল হ'ক, বদমাইস হ'ক এসেছিলতো।' রুনু ক্ষমাহীনভাবে আমার দিকে তাকায়। 'তাহলে না-গিয়ে ভালোই করেছি। ও তোমাকে একটা চাকরির জন্য সেই ওয়াটসন কোম্পানির পার্সোনেল ম্যানেজারের সঙ্গে শুতে বলেছিল না ?' আমি ওকে মনে করিয়ে দিই।

'তার জন্য তো ক্ষমা চেয়েছিল বাবার কাছে। তাছাড়া এসময়ে যে কেউ এসে দাঁড়াতে পারে। একমাত্র তুমিই এলে না। আর নবীন যা করেছে তার তুলনা হয় না। ছুটোছুটি দৌড়োদৌড়ি থেকে শুরু করে টাকার যখন যা দরকার হয়েছে— সত্যিকারের বন্ধু বলতে যা বোঝায়।'

'তাহলে তো ওর ঋণ সত্যিই তুমি শোধ দিতে পারবে না।' আমি বলি।

'তা ঠিক।' অন্যমনস্কভাবে ঘাড় নাড়ে রুনু। সেদিন যে ও ৩০ মিনিট দেরি করে এসেছে আমি আর তা মনে করিয়ে দিই না।

এইভাবেই বেশ কিছুদিন কেটে যায়। রুনু বোনাসের টাকা পায়। আমিই নবীনের জন্য শার্ট ও প্যান্টলেংথ পছন্দ করি, বাড়িতে নেমতন্ন করতে বলি। ইতিমধ্যে নবীন যে ওর যথার্থই বন্ধু তা-ও আমি বিশ্বাস করেছি। এদিকে আমার বাড়িভাড়া পাঁচমাসের বাকি, মুদির দোকানে ধার, (আর আমি মাঠে যাই না। ভদ্দিনে বুঝে ফেলেছি, আমার আর কোনোদিনই ওদিকে যাওয়া উচিত না) ইলেকট্রিকের বিলও বেশ কয়েকটা বাকি পড়েছে, ডিসকানেকশান নোটিশ দিয়েছে, আমি মরীয়া হয়ে একদিন রুনুকে বলি, 'নবীনের কাছ থেকে হাজার খানেক টাকা ধার এনে দাও না, আমি কিছুদিনের মধ্যে শোধ দিয়ে দেব।' বলি এই ভরসায় যে খবরের কাগজে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা ফিচার লিখেছি, কিন্তু টাকা পেতে এখনো মাস দুয়েক দেরি।

কিন্তু আমার কথা শুনেই গম্ভীর হয়ে যায় রুনু, তার কপালে বিরক্তির রেখা ফুটে ওঠে, সে বলে, 'ওতো এখন বাইরে চলে যাবে। দেখি ফিরে এলে যদি—।' আমি আর

কিছুই বলি না। তবে মাঝখানে একদিন রুনুর কাছে একশোটাকা চাই। রুনু হঠাৎ রাগে ফেটে পড়ে বলে, 'কী ভেবেছো তুমি, আমি কি কল্পতরু? বাড়ির লোক থেকে শুরু করে তোমরা সকলেই শুধু আমার কাছে টাকা চাও?'

আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। লজ্জায় ও আত্মগ্লানিতে কালো হয়ে যেতে যেতে লক্ষ্য করি রুনুর মুখ ঘৃণায় কুঁচকে গেছে। আর কিছুই বলি না। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে এক শনিবার হঠাৎ রুনু বলে, 'না, আজ যেতে পারব না। নবীন লাঞ্চে নেমতন্ন করেছে।' 'সে কি! কোথায়?' আমি বলি। উত্তরে একটা কুখ্যাত পাড়ার বার-এর নাম করে রুনু। আমি ওকে বলি, 'না, ওখানে লাঞ্চে যেও না রুনু।' 'কেন যাব না?' রুনু টেলিফোনেই প্রশ্ন করে, 'তোমার সঙ্গে গেলেই শুধু চা খাওয়া আর কথা বলা। আমি 'ফেড্‌আপ', রুনুর মুখে 'ফেড্‌আপ' শুনে আমি সত্যিই স্তম্ভিত হ'য়ে যাই। অনেক সাধ্যসাধনা ক'রে ওকে আসতে বলি। সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা করি ওর কাছ থেকে একপয়সাও নেব না। যে করেই হ'ক আমাকে টাকা জোগাড় করতে হবে।

পরের বৃহস্পতিবার আমি টাকা ধার ক'রে ওকে সিনেমায় নিয়ে যাই। সেখানে রুনুই অন্ধকারে আমার হতে ধ'রে আমাকে আদর করতে বলে। অনেকক্ষণ অন্ধকারে আমার হাত বুকে চেপে ধরে রাখে ও। কিন্তু তারপরই রাস্তায় বেরিয়ে এসে বাসে চাপার আগে বলে 'শনিবার ফোন ক'রে এসো।'

'কেন ফোন করার কী দরকার?'

'না ফোন ক'রে এসো।' ও জেদী গলায় বলে।

'না ফোন করব না।' আমিও জেদ ধরে বসি। ইতিমধ্যে বাস এসে যায়। রুনু চলে যায়। মাঝখানে ক'দিন আমি আর ফোন করি না। শনিবার নির্দিষ্ট বাসস্টপে যখন ঘণ্টাখানেক দাঁড়িয়েও রুনু আসে না, তখন বুঝি কোথাও গণ্ডগোল হয়েছে। আরো আধঘণ্টা দাঁড়াই, রুনু তবু আসে না। শেষে, রাত্রে ওদের বাড়ি চলে যাই। আটটার সময়ও রুনু আসে না। অথচ ওদের ছুটি হয়েছে আড়াইটায়। শেষকালে রুনু আসে, এসেই খাটে শুয়ে পড়ে। ওকে দেখেই আমার মনে হয় সামান্য মাতাল। 'রুনু', আমি বলি, 'এত দেরি হল যে, আমাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখলে যে—'

'আমাকে নিশ্চয়ই খারাপ মেয়ে ভাবছ', হঠাৎ রুনু ছলছল আরক্ত চোখে তাকায়, বলে, 'নবীন আর আমি আজ বেলাদিদের খেতে বলেছিলাম ব্লু মুন-এ'

'সেইজন্য আমাকে দাঁড় করিয়ে রাখলে!'

'কী করব? উপায় ছিল না। আজই ছোটুর সাপ্লাই অর্ডারের সার্কুলার বেরিয়েছে অফিসে। ওর ব্যবসাটা হবে। নবীন করে দিয়েছে।' সে হাসে

'সাপ্লাই অর্ডার!' আমি স্তম্ভিত হ'য়ে বলি, 'জনঅরণ্য দেখনি? এসব অর্ডারের জন্য কী দিতে হয় তা জানো না?'

'কিছু না, কিছু না।' গায়ের আড়মোড়া ভেঙে হাই তুলে রুনু বলে, 'শুধু নবীনের

মোটরসাইকেলে চেপে ঘুরলে আর ওর সঙ্গে রেস্তরাঁয় খেলেই ও খুশি। তার চেয়ে বেশি কিছু ও চায় না। কিন্তু সত্যিই আমি দুঃখিত মনীশ। তোমাকে এতক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি, ফোন করলে না কেন? তাহলেই গণ্ডগোল হ'ত না।

আমি এরপর বেরিয়ে আসি। অসহ্য অপমানে আমি তখন অসাড় হয়ে গেছি, গণ্ডগোলের সূত্রপাত বলা যায় এখান থেকেই। কিন্তু কাকে দোষ দেব? সবচেয়ে বড় দোষী তো আমি-ই। হ্যাঁ, আমিই দোষী!

লেখকের বক্তব্য

যাক, মনীশ যে দোষ স্বীকার করেছে এতে তার অপরাধ না-কমলেও অন্তত নিজের কাছে কিছুটা হাল্কা বোধ সে করতে পারে। কিন্তু যার চরিত্রে এই ধরনের দোষ, এই ধরনের দায়িত্বহীন যে, তার জীবন সম্পর্কে অভিযোগ করার অধিকার যে নেই, এটা পরিষ্কার। এবার বুঝতে পারছি, কেন কারও সম্পর্কেই তার কোনো অভিযোগ ছিল না। অভিযোগ করার যোগ্যতাই, মনীশের ছিল না।

মনীশের নোটবুক

আমার হাতে যে-পরিমাণ কাদা লেগে আছে, তাতে অন্যকে পরিষ্কার করতে চাওয়ার যোগ্যতা আমার নেই, অধিকারও নেই। নিজের ভেতর যে-অন্ধকার, যে-কাদা আমি লক্ষ্য করি, যা মাঝে মাঝে আমাকে পিষে থেঁৎলে ফেলতে চায়, তাকে আমি এড়িয়ে যেতে চাই না। আজ বুঝি পাপ ও দোষ কাকে বলে, রুনুর বিরুদ্ধে আজ আর তাই আমার কোনো অভিযোগ নেই। যদিও রুনুকে আমি ১লা বৈশাখের পরের দিন কাদায় ডুবিয়ে দিয়েছি। কিন্তু সেদিন আমি সত্যিই মর্মান্তিক কষ্ট পেয়েছি, ভয়াবহ এক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে হেঁটে গেছি সারাক্ষণ! কিন্তু তার আগে আরেকদিনের কথা বলে নিতে হবে যেদিন আমার সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যাবে ব'লে রুনু টাকা নিয়ে এসেছিল ধার ক'রে, আর সেটাকা আমি রেসের মাঠে লাগিয়ে হেরে যাই। কী ভয়ানক মর্মান্তিক লেগেছিল সেদিন রুনুর গলা 'তুমি যাবে না?' সে যেন বিশ্বাসই করতে পারছে না, আমি তার সঙ্গে সারাদিন একা একটা ঘরে না-থেকে চলে যাব রেসের মাঠে— একথা সে বিশ্বাস করবে কি ক'রে? আজ অবশ্য আমার নিজের কাছেই এটা অবিশ্বাস্য লাগে, কিন্তু সেদিন পেরেছিলাম। একবার নয়, বারদুয়েক। বোধহয় সেদিন থেকেই রুনু আমার কাছ থেকে স'রে যায়, ঘৃণা করতে শুরু করে আমাকে। স্বাভাবিক। এরপর রুনুর দেয়া সমস্ত অপমানই আমার প্রাপ্য। এরপর ১লা বৈশাখের কথা আমি বলতে পারি। সেদিন আমার যাওয়ার কথা ছিল না। তার আগের দিনই আমি রুনুদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়েছি। একটু রাত হ'য়ে গেছিল, রুনু আমাকে থেকেও যেতে বলেছিল রাত্রে, কিন্তু থাকিনি।

থাকিনি বলেই পরের দিন আবার গেলাম বেলা ৩টে নাগাদ। ওদের গলির মুখে পা দিতেই দেখি একটা নীল প্রাইভেট কার, নম্বর দেখে বুঝলাম রেন্টাল কার। গাড়ি থেকে বলিষ্ঠ চেহারার একজন লোক নামল, তার একহাতে শাড়ির প্যাকেট, অন্যহাতে মিষ্টির প্যাকেট সেলোফেনে মোড়া। আমার কিছুটা আগে বেশ বড় বড় পা ফেলে হেঁটে গেল লোকটি। আমিও তার পেছনে হেঁটে রুনুদের বাড়িতে পেঁাছে দেখি সে-ও ঢুকছে। এবার আমি বুঝলাম, এই নবীন। লোকটি ঢুকল সামনের বৈঠকখানায়, আমি পাশের ঘরের দরজায় কড়া নাড়তেই রুনু বেরিয়ে এল, পরনে হাউসকোট। আমাকে পাশের ঘরে বসতে বলে সে চলে গেল বৈঠকখানায়, একটু পরেই খুশির হুল্লোড়, ও তারপরেই কিছুটা নিচু গলার ফিশফিশ, টিভি ছেড়ে দিয়ে নিচু গলায় কথা বলার ধরণ শুনে বুঝতে পারলাম কিছু একটা পরামর্শ হচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে রুনুর ছোটভাই প্যাণ্টজামা পরে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে মনে হল লোকটিও বেরিয়ে গেল। আমাকে বৈঠকখানায় নিয়ে গেল রুনু, তারপর বলল, 'নবীন বরানগর গেল ওর বন্ধুদের কাছে। বেশ চটে গেছে।'

'কেন ?' আমি একটু কৌতূহলী হয়ে বলি।

'ভেবেছে আমি তোমাকে আসতে বলেছিলাম। অথচ আমি জানতামই না তুমি আজ আসবে।'

'আমি তো আসতেই পারি।'

'ঠিক আছে, মিষ্টি খাবে ? এই যে নবীন এনেছে।'

'না, খাব না।' আমি বলি, 'তোমার জন্য শাড়ি এনেছে বুঝি ?'

'হ্যাঁ। আনলেই আজ পরব, এমন মানে নেই।'

'তুমি পয়লা বৈশাখে নতুন শাড়ি পর বুঝি ?'

'হ্যাঁ।'

'কই আমাকে বলনিতো।'

'এ আর বলার কী আছে ?' রুনু হাই তোলে। সে এবার ঘর থেকে বেরিয়ে যায়, তারপর একটা প্লেটে গোটা দুয়েক রসগোল্লা এনে বলে, 'নাও খেয়ে নাও।' পয়লা বৈশাখের দিন মিষ্টিমুখ করাই নিয়ম।' আমি খাই। এরপর হঠাৎ আমার কাছ থেকে উঠে কিছুটা দূরে গিয়ে বসে রুনু, বাইরের দিকে ইংগিত করে বলে, 'মা ভীষণ চটে গেছে, তোমার কাছে বসেছিলাম বলে।'

'সে কী ! মা চটবেন কেন ?'

'ঐ রকমই। মার মেজাজ হঠাৎ খারাপ হয়ে যায়।'

এবার রুনুর ছোটভাই বাইরে থেকে রুনুকে ডাকে। রুনু বেরিয়ে যায়, কথা বলে। তারপর ঘরের ভেতরে ফিরে এসে হঠাৎ বলে আমাকে 'নবীন ফিরে এসেছে। কিন্তু কিছুতেই এখানে আসতে চাইছে না মোড়ের চায়ের দোকানে বসে আছে, কী মুশকিল বলতো ?'

'কেন কী হলো ?'

'বলছে তুমি থাকলে ও আসতে পারবে না।'

এবার হঠাৎ মুহূর্তের মধ্যে আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যায়। পা থেকে মাথা পর্যন্ত অসাড় হয়ে যায় আমার। আমি কোনমতে টলতে-টলতে উঠে পড়ি, মুহূর্তের মধ্যে রুনুকে আমার এক ঝানু বেশ্যা বলে মনে হয়, আমি আস্তে আস্তে বলি, 'আমি এখন না গেলে কি তোমার চাকরি কিংবা ভাইয়ের ব্যবসার ক্ষতি হবে ?'

'না চাকরির কিছু হবে না', রুনু ভাবলেশহীন মুখে বলে। 'কিন্তু ভাইয়ের ব্যবসার ক্ষতি হতে পারে।'

'আমি তাহলে চলি।'

প্রায় টলতে টলতেই বেরিয়ে আসি আমি। বলা যেতে পারে এক অমানুষিক আঘাতে তখন আমার হাঁটারও শক্তি প্রায় নেই। কোনোমতে পা টেনে টেনে, মাথা নিচু করে ওদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে অনেকক্ষণ উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় হাঁটতে থাকি আমি। আমার কেবলই মনে হয় বেশ্যার সঙ্গে প্রেম সম্ভব, কিন্তু প্রেমিকা যদি বেশ্যায় পাল্টে যায়, তাহলে কী হতে পারে, তা আমার জানা নেই। সেই মুহূর্তে আমি রুনুকে ঘৃণা করি, এমন অমানুষিক ঘৃণা আমি আর কাউকে কখনো করিনি।

যতবার এ ঘটনার পর আমি রুনুকে প্রশ্ন করেছি, সে দিন আমি চলে আসার পর সে কী করেছিল, ততবারই তার পরস্পরবিরোধী কিংবা ভাসাভাসা উত্তর দিয়েছে সে। ফলে আমি যা ভেবেছি তা সত্য হলে তার চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু হতে পারে না। অথচ তা স্বাভাবিক ছিল। পরের দিন রুনুকে আমি বেশ্যা বলে গাল দিই, ক্ষমা চাই। আবার গাল দিই। ক্ষমা চাই। এরকমই এখন হয়ে আসছে অনেকদিন। দুবার আমি চলে যেতে চেয়েছিলাম, পারিনি, দুবারই ফিরে এসেছি। তৃতীয় বারের জন্য এবার আমি হয়ত ভেতর ভেতর প্রস্তুত হচ্ছি। হয়ত আবার পারব না। অথচ আশ্চর্য রুনু এখনো আমাকে শারীরিকভাবে চায়। নবীনের সঙ্গে যে ওর কোন শারীরিক সম্পর্ক নেই, তা ও বারবার আমাকে বলেছে। আমি বিশ্বাস করিনি, আজো করি না। এটাও ও জানে। আমি মাঝে মাঝে জঘন্য ভাষায় ওকে গালাগাল দিই। ও মাথা নিচু করে শোনে, কখনো কখনো কাঁদে, কখনো কখনো তীব্র ঝাঁঝালো উত্তর দেয়। আমাকে পরিষ্কারই বলেছে 'তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ভাঙার জন্যই আমি নবীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করি।'

'কিন্তু কেন ?'

'তুমি আমাকে ওর কাছ থেকে টাকা ধার করতে বলেছিলে—'

'আর ?'

'তুমি বাবার ওষুধের টাকা দিয়ে রেস খেলেছো।'

'আর ?'

'তুমি আমার বোনাসের সব টাকা দিয়ে রেস খেলেছো।'

'আর ?'

'ব্যাস্ এই', বলে সে হাসে। কিন্তু বলে না যে 'এই কি যথেষ্ট নয় ?'

আমি মাথা নিচু করে থাকি। আমার কিছুই বলার নেই। আমি যে মূর্তি বানিয়েছিলাম, সে মূর্তি নিজেই ভেঙেছি, এখন সে কদাকার হয়ে গেছে বলে আক্ষেপ করলে কী হবে ? কেন আমার এখন এমন ক্ষমতা নেই ঈশ্বর, যে রুনুর সমস্ত দায়িত্ব আমি নিই ? সে তো তাই চায়, সে তো তা-ই চায়।

মৃত্যুর আগে ওকে আমি সুখী দেখতে চাই। আমি ওর ক্ষতি করেছি, যদি ওর ক্ষতি হয়ে থাকে, কিংবা বলা ভালো নিজের ক্ষতি করে ও আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছে আমি-ই তার জন্য দায়ী। কিন্তু ও আমাকে এখনও ছেড়ে যায়নি।

আমি জানি না কী করব ! মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া মরণোন্মুখের আর কী করার আছে।

লেখকের বক্তব্য

মনীশের এই দীর্ঘ স্বীকারোক্তির পর তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়ত মুশকিল। কিন্তু প্রশ্ন থেকেই যায়, তার চরিত্রের ভিতর এমন কিছু আছে কিনা, যা তাকে অনিবার্যভাবে এক ভুল থেকে আরেক ভুলের দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে। বলা যেতে পারে সমস্ত ভুল ও দোষের একেবারে তলায় গিয়ে ভেতর থেকে তাদের দেখার প্রবণতা যে লেখকের পক্ষে অনিবার্য তা আমি মনে করি না। সে যে অন্ধকারের জীব তাতো নয়, তবু টমাস মান যে লেখককে 'মানুষের' চেয়ে 'জীব' বলার বেশি পক্ষপাতী তা আমি জানি। মনীশকে ঠিক প্রতারক বলা যাবে কিনা, সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই, কিন্তু নিজের সম্পর্কে যে সে শেষপর্যন্ত কিছুটা নির্দয় হতে পেরেছে, এতে অন্তত আমি কিছুটা হাল্কা বোধ করছি। এরকম লোকের স্বপক্ষে বলার লোক নেই। কিন্তু সে যদি নিজেই নিজের বিপক্ষে বলে তাহলে অন্তত তার কাজের সঙ্গে কথার একটা সামঞ্জস্য থাকে। অতএব মনীশের আত্মবিরোধিতা যে তার নিজেরই নিজেকে দেখার একটা ধরণ, একথা আমি পাঠকদের স্মরণ করিয়ে তাঁদের সতর্ক থাকতে বলব যেন তাঁরা অকারণ সহানুভূতির খপ্পরে না-পড়েন। তবু যদি তাদের কারও সহানুভূতির উদ্রেক হয়, তাহলে তাঁদের লক্ষ্য করতে বলব, মনীশ ঠিক কোন জায়গায় নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব বা শূন্য করে দিয়ে সেখানে কী তৈরি করতে চেয়েছিল।

মনীশের নোটবুক

মানুষকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, অথচ একের পর এক (শুধু রুনুর নয়) সম্পর্ক, লক্ষ্য করছি, হাতের মধ্য দিয়ে জল বা বালির মতো গড়িয়ে চলে যায়। শেষপর্যন্ত

থাকে না। কেবল চারপাশে যে গাছ, ঘাস, নুড়ি, পাথর, জল নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে বা বয়ে চলেছে, সেখান থেকে কোনো সংকেত আসছে কিনা লক্ষ্য করতে চাই। মনে হয় ঐ অসীম নৈঃশব্দ্যের জগতে এমন কোনো ভাষা আছে যা পড়তে পারছি না, একবার পড়তে পারলে, আমিও শিকড়ের মতো চলে যেতে পারব ভূগর্ভের অন্ধকারে, ফুলের বা ডালপালার মতো অগ্রাহ্য করতে পারব মহাকর্ষের টান, জলের মতো প্রতিমুহূর্তে নিজেকে পাল্টে ফেলে বয়ে যেতে পারব, হাওয়ার মতো উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারব ঝরা পাতার রাশি, আর ঝরা পাতার মতোই স্বেচ্ছায় ভেসে যেতে পারব নিজের পরিণাম লক্ষ্য করে হাওয়ায়।

শুধু একবার যদি ততদূর স্তব্ধ হয়ে যেতে পারি যতদূর হ'লে আমার ভিতর ফুটে উঠবে সেই ভাষা যা আমি নিজে, যা আমার সম্পূর্ণ জীবন অথচ যা বহুদিন ব্যবহার করিনি বলে এতদিন ভেবেছি ভুলে গেছি। □